গবেষণা অভিসন্দর্ভের

সারসংক্ষেপ

(Abstract)

নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে পশ্চিমরাঢ়ের আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ভূমিকা:

রাঢ় এক অতি প্রাচীন দেশের নাম। এক সময় ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রাঢ় ভূমি নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব ভারতের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও সুহ্ম নামে যে অঞ্চল পরিচিত ছিল তা রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করত। রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতে প্রাচীন গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা জটিল ও বিতর্কমূলক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতার উত্থান ও পতনের ফলে রাস্ট্রীয় সীমা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বঙ্গের নাম, শিল্প সংস্কৃতি ও রাস্ট্রীয় সীমা পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের সীমানা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পন্ডিত, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য দেখা যায়। এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে একাধিক স্বীকৃত ঐতিহাসিক মতের উপর ভিত্তি করে মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, প্রাচীন রাঢ়দেশ সাধারণত গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন রাঢ়ের সীমানা হল- উত্তরে মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, পূর্বে হাওড়া কলকাতা থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুকুমার সেনের মতে, একদা রাঢ়দেশ বলতে গঙ্গার ওপারের কিছু অংশ এবং এপারে দামোদরের প্রাচীন খাত বাঁকা বল্লুকা (বেহুলা) পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে রাঢ়ী উপভাষার দেশ বলতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং হুগলী প্রভৃতি জেলা গুলোকে বোঝায়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি পর্যন্ত বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। অতএব দেশ বা রাষ্ট্রের সীমা কোনো চিরন্তন সীমারেখা দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে কিংবা প্রশাসকের রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভে রাষ্ট্রের সীমা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য প্রদেশ বা রাষ্ট্রের যে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমারেখা যে সুনির্দিষ্ট আছে তা বলা যায় না। আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্ণধারদের ক্ষমতা ও কর্মনীতির উপর রাষ্ট্রের সংকোচন প্রসারণ নির্ভর করে। এক কথায় বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ের বিশাল আয়তন। উত্তরে রয়েছে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম, পূর্ব দিকে বর্ধমান ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমা থেকে পশ্চিমে পুরুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব মেদিনীপুর বাদে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সংলগ্ন কিছু অংশ নিয়ে বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চল। ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিশাল ভূখন্ডের অধিবাসীদের তাদের আঞ্চলিকগত আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিগত নানারকম পার্থক্য থাকার জন্য এই রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. পূর্বরাঢ় ২. পশ্চিমরাঢ়। আয়তনের

দিক দিয়ে বিচার করলে পশ্চিমরাঢ়ের আয়তন বড়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম হল পশ্চিমরাঢ়। বাকি অংশ পূর্বরাঢ়।

প্রথম অধ্যায়: রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা ও আদিবাসী সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এবং বাংলা ছোটগল্পে তাদের অবস্থান

আদিবাসী কথাটির অর্থ 'আদিম যে বাসিন্দা'। আদিবাসী বলতে সাধারণত ভারতবর্ষে মানব সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে জাতি বিরাজমান সেই জাতি আদিবাসী নামে পরিচিত। সাধারণত যাদেরকে আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়, তারা সকলে আদিযুগ থেকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করে। কারণ আদিযুগের মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে কিংবা খাদ্যের সন্ধানে তারা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত। আবার কখনো নানান প্রকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে হত। আদিকাল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই জায়গায় বসবাস করা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে সমাজে আদিবাসী বলতে সেই সব জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নিজস্ব জীবন ধারণের মাধ্যমে প্রাচীন পদ্ধতিকে অনেকটা অপরিবর্তিত রেখেছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এরা আদিবাসী। আদিবাসী শব্দ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়- এটির ব্যবহার উপজাতি, জনগোষ্ঠী, কিংবা ইংরাজি শব্দ 'Tribe' অর্থে। ভারতবর্ষের সংবিধানে এদের তপশিলী উপজাতি বা সিডিউল্ড ট্রাইব নামে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইংরাজি 'tribe' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আদিবাসী বোঝাতে 'উপজাতি', 'আদিমজাতি', 'খন্ডজাতি', 'গিরিজন' ও 'জনজাতি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। যেহেতু তারা সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বসবাস করে আসছে, তাই আদিবাসী বলাই যথার্থ হবে। ভারতবর্ষের সমাজজীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসীরা আর্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে তাদের উত্থান পতনের কাহিনি মুখ্য বিষয় ছিল, আদিবাসীরা যে এদেশের বাসিন্দা তা তারা স্বীকার করেনি। কিন্তু আর্যরা তাদের গুরুত্ব না দিলেও এইসব জনজাতি যে ভারতের আদিম আধিবাসী নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার মাধ্যমে তা জানতে পারা যায়। আর্য আগমনের বহুকাল পূর্ব থেকে তারা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল।

শিরোনামে উল্লিখিত আদিবাসী শব্দটির মধ্যে দিয়ে রাঢ়ের প্রাচীনতম অধিবাসীদেরকে বোঝায়। সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে তাদের বসবাস। তবে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি সংখ্যায় বেশি ছিল। যেমন- সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, মুণ্ডা, লোধা, কোল, কোড়া, ভূমিজ, হো ওঁরাও, বিরহড় প্রভৃতি। পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলে এরা দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছিল। উল্লিখিত জাতিগোষ্ঠীগুলি সব আদি-অস্ত্রাল(প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) জাতির অন্তর্গত ছিল। এই আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠী পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ভূমির নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। এদের ভাষা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। আজও

রাঢ়ভূমির আনাচে কানাচে এমন বহু সংখ্যক ভাষা প্রচলিত, যে ভাষাগুলির মূল উৎস অস্ট্রিক ভাষা। অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষরা ভারতের আদি-অধিবাসী। এদের উত্তর পুরুষরা হল সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর, খেড়িয়া, লোধা, হো, ভূমিজ, বিরহড়, কোড়া, মাহলি ও অসুর প্রভৃতি জনজাতি। এই উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা পশ্চিমরাঢ়ের আদি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। আর্য সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পূর্বে সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমরাঢ়ে অনার্য জাতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও গড়ে তুলেছিল।

গবেষণা অভিসন্দর্ভে সাঁওতাল, শবর, খেড়িয়া, লোধা ও মুণ্ডা এই পাঁচটি আদিবাসী সম্প্রদায়কে নির্বাচন করেছি। H.H Risley তাঁর *The Tribes and Castes of Bengal* নামক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে বাংলার আদিবাসীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত আদিবাসীদের শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের কথায় উল্লেখ করেননি, একই সঙ্গে তাদের আচার আচরণ জীবনযাত্রা ও ধর্মের কথাও বলেছেন। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়। আদিবাসীরা তাদের সংস্কৃতিকে বজায় রাখার জন্য তারা অন্যান্য সমাজের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সভ্যতার বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির কোনোরকম পরিবর্তন দেখা যায়নি।

আমার গবেষণায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র ও নলিনী বেরা এই কয়েকজন সাহিত্যিককে নির্বাচন করেছি। বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে আদিবাসী সমাজজীবনের চিত্র পাওয়া যায়। চর্যাকাররা ৯০০- ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সাধনার গূঢ়ার্থ রচনা করেছিলেন। তারা সমাজের বিভিন্ন জাতির জীবনকে তুলে ধরে সাধনার গূঢ়ার্থ সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যে আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন লোকাচার প্রবল ভাবে দেখা যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পর উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া না গেলেও, কিছু জায়গায় তাদের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথাকথিত সমাজের উপর তলাকার মানুষের নিয়ে সাহিত্যে রচনা করলেও, তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি জাতির উৎপত্তির কথা বলতে, আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ডা, বিরহড় ও খেড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের বর্ণনা করেছেন।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে তাসখন্দে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা ধারায় সমাজতন্ত্রবাদের অনুপ্রবেশে ঘটে, তা ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে একদল তরুণ লেখকগোষ্ঠী সমকালীন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে রচনার বিপরীত পথে হাঁটতে

শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবমুক্ত হওয়া কল্লোলীয়ানদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন। *কল্লোল* পত্রিকার লেখকগণ এই সহায় সম্বলহীন, প্রান্তবর্গীয় মানুষদেরকে সাহিত্য তথা সমাজে পরিচয় দিলেন। পূর্বসুরী সাহিত্যিকরা সমাজের প্রান্তবাসীদের বহু বিচিত্র জীবন যন্ত্রনার ঘটনা নিয়ে সাহিত্যে রচনা করেননি। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা প্রথম উপেক্ষিত মানুষের দিকে চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন। কথাসাহিত্যে এইসব ব্রাত্য চরিত্রগুলিকে বাস্তব পটভূমিতে যথাযোগ্য ও নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা সমাজের বুকে প্রান্তবর্গীয় মানুষদের অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে এক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যা সমকালীন সাহিত্যে আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাদেরই একজন লেখক ছিলেন। তাঁর লেখক হয়ে ওঠার পিছনে শোষিত, বঞ্চিত আদিবাসী মানুষদের অবদান রয়েছে। তাঁর গল্পে প্রথম কাহিনির মূল বিষয়বস্তু রূপে আদিবাসীদের জীবনযন্ত্রণাকে দেখা যায়। কয়লাখাদানের শ্রমিক আদিবাসী সাঁওতালদের ব্যক্তি জীবনের দুর্দশা ও বঞ্চনার সাক্ষী হয়ে উঠল তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পগুলো।

তৃতীয় অধ্যায়: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজাতির আখ্যান বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) তাঁর ছোটগল্পে গ্রাম বাংলার অনাড়াম্বর জীবনযাপন বর্ণনা করেছেন। স্মৃতিচারিতা ও প্রকৃতির বিমুগ্ধতার পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে আলাদা জগতে নিয়ে যায়। যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থাকে না, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, প্রকৃতির প্রতি যে দরদ ও রোমান্টিকতা তা পশ্চিমী দুনিয়ার আধুনিকতা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে যে ইউরোপীয় মডেলের গল্প, উপন্যাস লেখার রীতিকে অগ্রাহ্য করে দেশীয় সুর ও ভঙ্গি যোগে বাংলার লোককথা, রূপকথা, পুরাণকথাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নাগরিক জীবনের বাইরে থাকা সাধারণভাবে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনধারার বাহক, যারা সমাজের হাড়-হাভাতে খেটে খাওয়া, কোনমতে চেয়ে-চিন্তে একবেলা পেটপুরে খেতে পায় সেই সব প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটু করে প্রকৃতি চর্চা করায় তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনাগুলিতে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা আদিবাসীদের জীবনের চাহিদা, ব্যর্থতা, হাসি কান্না মেশানো জীবনযাত্রার নানা ছবি পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা কথাসাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। রবীন্দ্র- শরৎ উত্তর কথাসাহিত্যে তাঁর স্থান অভ্রভেদী। উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি উচ্চস্তরের সাফল্য দেখিয়েছেন। আঞ্চলিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, পরবর্তীকালে তিনি রাঢ় অঞ্চল কেন্দ্রিক সাহিত্যে রচনা করেছিলেন। তারাশঙ্করের সাহিত্যে পরাধীন ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের আগমনে সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙনে গ্রাম সমাজ আত্মসম্মানের দাবিতে মাথা তুলে দাঁড়ায় অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির অবসান অপরদিকে ধনতন্ত্রের সূচনা হয়। এখানেও শ্রেণি সংঘর্ষের ব্যক্তিগত দিকটা তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কখনও ছোটগল্পের সীমিত পরিসরকে অতিক্রম করে রাঢ় অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে অসাধারণ নৈপুণ্যতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি ছোটগল্প ও উপন্যাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে প্রান্ত সমাজের জাতিগত ও শ্রেণিগত বৈষম্যর চিত্র রয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে মাঝিমাল্লা, মুচি, হাড়ি, বাগদি, জেলে, কুমোর, ডাকাত, ডাইনি, ফাঁসুড়ে, কোল, সাঁওতাল ও মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

মহাশ্বেতা দেবীর(১৯২৬-২০১৬) ছোটগল্প ও উপন্যাসে সমাজে যারা অবহেলিত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত, স্বাধীনতা লাভের পরেও যাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, প্রশাসনের ঔদাসীন্য ও উৎপীড়ন যাদের প্রতিনিয়ত সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়, তাদের হয়ে তিনি ন্যায় খোঁজেন। তাঁর বেশিরভাগ রচনায় পিছিয়ে পড়া মানুষের উপর মালিক বা দালালদের অত্যাচার গল্পের মূল বিষয়বস্তু। তিনি আদিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানার জন্য দীর্ঘ দিন তাদের সঙ্গে মিশেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ভগীরথ মিশ্রের নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

ভগীরথ মিশ্র তাঁর ছোটগল্পগুলিতে গ্রাম্য জীবন ও শহুরে জীবন দুটোই পাওয়া যায়। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্পে শহর জীবনের ছোঁয়া থাকলেও গ্রাম্য জীবনের ব্রাত্যজনের মুখের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। আধিপত্যবাদী সমাজে যারা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত, সাহিত্যের আঙিনায় যাদের স্থান নেই, সেই সব মানুষের মুখের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়: নলিনী বেরার নির্বাচিত ছোটগল্পে আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতি

নলিনী বেরার সুবর্ণরেখা তীরবর্তী গ্রামবাংলা কেন্দ্রিক মানুষের নিপুণ কথাকার। জন্মভূমি মাটির সঙ্গে নাড়িরটান, সেই ভিজে মাটির সোঁদা রুক্ষ গন্ধ, সেখানকার মানুষের সঙ্গে প্রাণের নিবিড়তা, তাদের সুখ-দুঃখ, রাগ-অভিমান, ব্যথা বেদনা, ঈর্ষা-দ্বেষ সব কিছুই তাঁর মনকে প্রতিনিয়ত স্পর্শ করেছে। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে গ্রামবাংলার এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষ তাদের বিচিত্র সংস্কার, কুসংস্কার, লৌকিক বিশ্বাস ও অসহায়তার ছবি ফুটে উঠে।

অষ্টম অধ্যায়: পশ্চিম রাঢ়ের কয়েকজন আদিবাসী সাহিত্যিক

আদিবাসী জগৎ সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে তাদের সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধারণার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। তাদের বংশ পরম্পরায় শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত আখ্যানসমূহের পুনর্গঠন ও পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং লিখিত আকারে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তারা জীবন সংগ্রামের ক্রমবিবর্তনের বয়ানটি গড়ে তুলেছিল। সাঁওতালি লেখকরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতীক সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে তাঁরা গল্পের বিষয় সংগ্রহ করত। গল্পে বিপ্লবীদের জীবনকে কেন্দ্র করে এক ভিন্ন ধরনের আখ্যান তৈরি করতে দেখা যায়। একদিকে তাঁরা অতীতের গৌরবকে স্বীকার করেছে অন্যদিকে এক শিক্ষিত সাঁওতাল সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

উপসংহার:

আমার গবেষণায় মূলত দুটি বিষয় সমান্তরালভাবে এসেছে, প্রথমত পশ্চিমরাঢ়ের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে এই অঞ্চলের বসবাসকারী আদিবাসীদের সাধারণ পরিচয়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মিথ-বিশ্বাস-প্রথা-ট্যাবু প্রভৃতি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থা। আদিবাসীদের সমাজ, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর নেমে আসা নানারকম অভিঘাত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা এবং তাদের প্রতি অনাদিবাসী উচ্চবর্গের মানসিকতার পরিচয়। দ্বিতীয়ত ছোটগল্পগুলিতে একটা বিস্তৃত সময়পর্বে আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের দিকগুলি বাস্তবনিষ্ঠ নির্মাণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ। বাংলা ছোটগল্পে বিস্তৃত ক্যানভাসে উপেক্ষিত আদিবাসীদের গোষ্ঠীজীবন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও পালা-পার্বণকেই তুলে ধরা হয়নি। একই সঙ্গে তাদের উপর দীর্ঘদিনের আর্থিক শোষণ ও নির্যাতনকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক   গবেষক